নবীনচন্দ্র সেনের ‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত’

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ পর্বে যে কয়েকজন কবি বাংলা কাব্যধারাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, পাশ্চাত্য কাব্যরীতির সফল প্রয়োগ, মহাকাব্য রচনা এবং বাংলা ভাষাকে আধুনিক কাব্যভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এই মহান কবির জীবনাবসানের পর সমকালীন কবি নবীনচন্দ্র সেন গভীর শোক, শ্রদ্ধা ও আত্মসমালোচনার অনুভূতি নিয়ে রচনা করেন **‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত’** কবিতাটি। এটি কেবল একজন কবির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ নয়; বরং সমগ্র বাঙালি জাতির কৃতঘ্নতার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ এবং জাতীয় আত্মসমালোচনার দলিল।

কবিতায় নবীনচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন যে, যিনি বাংলা সাহিত্যকে নতুন জীবন দান করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনিই অবহেলা, দারিদ্র্য ও অনাদরের শিকার হন। তাই কবিতাটি যেমন শোকগাথা, তেমনি জাতীয় বিবেককে জাগ্রত করার আহ্বানও বটে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ছিল অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর ট্র্যাজেডির সমন্বয়। সাহিত্যজগতে অসামান্য সাফল্য অর্জন করলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানা সংকট, ঋণভার, অসুস্থতা এবং আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। যাঁর সাহিত্যকীর্তি বাংলা ভাষাকে বিশ্বমানের মর্যাদা দিয়েছিল, তাঁকেই জীবনের শেষ সময়ে সমাজের অবহেলা সহ্য করতে হয়। এই বাস্তব ঘটনাই নবীনচন্দ্র সেনকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। তিনি উপলব্ধি করেন, বাঙালি সমাজ তার শ্রেষ্ঠ কবিকে যথাযথ সম্মান দিতে পারেনি। এই উপলব্ধি থেকেই রচিত হয় কবিতাটি। ফলে এটি শুধু ব্যক্তিগত শোকের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং একটি জাতির নৈতিক ব্যর্থতার দলিল।

কবিতার সূচনাতেই কবি বঙ্গভূমিকে বলেছেন— “কৃতঘ্ন, মা বঙ্গভূমি।” এই একটি শব্দেই কবির গভীর ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মনে করেন, বাংলা মাটিই তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে যথাযথ সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মধুসূদনের কাব্যধ্বনি ছিল কোকিলের সুমধুর কণ্ঠের মতো। তাঁর কবিতা সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে নতুন প্রাণ দিয়েছিল। যেমন কৃষ্ণের বাঁশির সুরে ব্রজবাসীরা মোহিত হয়েছিল, তেমনি মধুসূদনের কবিতায় সমগ্র বাংলা সাহিত্য আন্দোলিত হয়েছিল। এরপর কবি অত্যন্ত বেদনাভরে স্মরণ করেন যে, এমন একজন প্রতিভাবান কবিকে শেষ জীবনে ভিক্ষুকের মতো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

> “অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গবিকূলেশ্বরে
> ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়।”

এই পংক্তিতে কবির তীব্র অভিযোগ নিহিত রয়েছে। সমাজ একজন মহান প্রতিভাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যিনি বাংলা সাহিত্যকে অমূল্য সম্পদ দিয়েছিলেন, তাঁকেই দারিদ্র্য ও অনাদরের মধ্যে পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে।

এরপর কবি মধুসূদনের সাহিত্যিক অবদানের কথা স্মরণ করেছেন। তাঁর কন্ঠকে তিনি অমৃতধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর কাব্যধারা মানুষের হৃদয়কে যেমন আনন্দ দিয়েছে, তেমনি বাংলা ভাষার মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। মধুসূদনের মৃত্যুর পর এমন প্রতিভার অভাব গভীরভাবে অনুভূত হবে বলেই কবির আশঙ্কা। নবীনচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যকে একটি রত্নখনির সঙ্গে তুলনা করেছেন। মধুসূদন ছিলেন সেই খনির অমূল্য রত্ন। কিন্তু সময় সেই রত্ন কেড়ে নিয়েছে। কবির মনে হয়েছে এমন রত্ন কি আর কখনও জন্ম নেবে? এই প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে গভীর হতাশা ও শোক। কারণ মধুসূদনের মতো প্রতিভা যুগে যুগে জন্মায় না। তিনি ছিলেন অনন্য, অদ্বিতীয় এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

কবিতার শেষ স্তবকে কবি বলেন— "শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন।" অর্থাৎ মধুসূদনের মৃত্যুর ফলে বাংলা কবিতার আসন শূন্য হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন কল্পনার সূর্য, বাংলা কবিতার মধু। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এখানে 'শমন' শব্দটি মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মৃত্যুই যেন বাংলা কবিতার মধু কেড়ে নিয়ে গেছে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবদ্দশায় যে সম্মান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন, তা তিনি পাননি। তাঁর মৃত্যুতে কেবল একজন কবির মৃত্যু ঘটেনি; বাংলা সাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ হারিয়েছে। কবি নবীনচন্দ্র সেন এই উপলক্ষে বাঙালি সমাজের কৃতঘ্নতা, উদাসীনতা ও অকৃতজ্ঞতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মধুসূদনের অসামান্য সাহিত্যকীর্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন আলোচ্য কবিতার ছত্রে ছত্রে।